কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ‘আত ও বিভক্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ৫. ৩. আল-জামা‘আত

৬. ৫. ৩. ১. অর্থ ও পরিচিতি

বিভক্তি বিষয়ক একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুক্তিপ্রাপ্ত বা সুপথপ্রাপ্ত দলের পরিচিতি হিসেবে বলেছেন: তারা জামা‘আত। জামা‘আত শব্দটি আরবী জাম’ (الجمع) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত করা, জমায়েত করা, ঐক্যবদ্ধ করা (To gather, collect, unite, bring together, join) ইত্যাদি। ‘জামা‘আত’ (جماعة) অর্থ জনগণ, জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (community, society).

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে ‘জামা‘আত’ এবং ‘ইজতিমা’-কে ‘ফিরকা’ ও ‘ইফতিরাক’-এর বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। ফিরকা অর্থ দল, গ্রুপ ইত্যাদি। এ অর্থে আরবীতে হিযব, কাউম, জামইয়্যাহ (حزب، قوم، جمعية) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর জামা‘আত অর্থ দলবিহীন সম্মিলিত জনগোষ্ঠী বা সমাজ। যে কোনো স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে ‘জামা‘আত’ বলা হয়। জামা‘আতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন। এরা মসজিদের জামা‘আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থৎ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা‘আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক কোনে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ইফতিরাক ও জামা‘আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত মসজিদের জামা‘আত ভেঙ্গে ইফতিরাক এসেছে। তিনটি ফিরকা মূল জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো ‘দল’ বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে ‘জামা‘আত’ বলতে পারেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অবস্থা এরূপই। এটি মূলত কোনো দল বা ফিরকা নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণের অনুসরণে যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোনো দল বা ফিরকা তৈরি করেননি তারাই ‘আল-জামা‘আত’।

৬. ৫. ৩. ২. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য অর্থে আল-জামা‘আত

কুরআন ও হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমগণের বক্তব্যের আলোকে আমরা ‘জামা‘আত’ (جماعة) শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখতে পাই: (১) ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজ, অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ, (২) সাহাবীগণ ও (৩) সাহাবীগণের অনুসারী তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল ধারার আলিম ও ইমামগণ।[1]

আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে ‘জামা‘আত’বদ্ধ বা দলাদলিমুক্তভবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং দল, ফিরকা তৈরি

ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসেও অনুরূপভাবে ‘জামা‘আত’-বদ্ধ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট যে, জামা‘আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে, ইমাম বলতে রাষ্ট্রপ্রধান বুঝানো হয়েছে এবং ‘বাইয়াত’ বলতে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের শপথ বুঝানো হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

‘‘যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা‘আত বা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[2]

মু‘আবিয়া (রা:) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগ দান করেন এবং তার আনুগত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক থেকে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ৬০ হিজরীতে মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ইয়াযিদ শাসনভার গ্রহণ করেন এবং চার বছর শাসন করে ৬৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। ৬৩ হিজরীতে মদীনার অধিবাসীগণ তার জুলুম-অত্যাচার, ইমাম হুসাইনের শাহাদত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিদ্রোহ করেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল যুক্তিসঙ্গত এবং একান্তই আল্লাহর ওয়াস্তে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা নিয়ে। কিন্তু তা সত্বেও সে সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বিদ্রোহে রাজী ছিলেন না। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) মদীনার অধীবাসীগণের বিদ্রোহের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু মুতি’র নিকট গমন করেন। তিনি তাকে সম্মানের সাথে বসতে অনুরোধ করেন। ইবনু উমর বলেন: আমি বসতে আসিনি। আমি তোমাকে একটি হাদীস শুনাতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

‘‘যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই সে ব্যক্তি জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[3]

অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ

‘‘যে ব্যক্তি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া (রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য ছাড়া) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করবে এবং যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে নিজেকে বের করে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলে নিজের জন্য কোন ওজর আপত্তি পাবে না।’’[4]

মু‘আবিয় (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ [عَلَيْهِ] إمام [بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ] مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

‘‘যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে তার কোন ইমাম নেই (কোন রাষ্ট্র প্রধান ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থার সে অধীন নয়), অন্য বর্ণনায়: যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তাঁর গলায় কোন বাইয়াত বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথ নেই, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।’’[5]

এভাবে হাদীস শরীফে সর্বদা জামা‘আত বলতে দলাদলিবিহীন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সামাজিক ঐক্য বুঝানো হয়েছে।

ফিরকা অর্থাৎ দল বা গ্রুপকে ‘জামা‘আত’ অর্থাৎ ঐক্য বা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ভাল বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি তাঁকে খারাপ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, এই ভয়ে যে, কি জানি আমি কোনো খারাপের মধ্যে নিপতিত হয়ে যায় কিনা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জাহিলিয়্যাত ও খারাপির মধ্যে ছিলাম। তখন আল্লাহ আমাদেরকে এই কল্যাণ এনে দিলেন। এর পরে কি আবার কোনো অকল্যাণ আসবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ ফিরে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে কিছু জঞ্জাল-ময়লা থাকবে। আমি বললাম, সেই জঞ্জাল-ময়লা কি? তিনি বলেন, কিছু মানুষ যারা আমার আদর্শ ও নীতি ছেড়ে অন্য আদর্শ ও রীতি অনুসরণ করবে। তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ দেখতে পাবে। আমি বললাম, এই ভাল অবস্থার পরে কি আবার খারাপ অবস্থা আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজাগুলির দিকে আহবানকারীগণ (আবির্ভুত হবে), যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চামড়ার মানুষ-আমাদেরই স্বজাতি, আমাদের ভাষাতেই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি এই অবস্থায় পড়ে যায় তবে আপনি আমাকে কি করতে বলেন, তিনি বলেন:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

‘‘তুমি মুসলিমদের জামা‘আত (সাধারণ জনগোষ্ঠী) ও তাদের ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-কে ধরে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোনো জামা‘আত না থাকে এবং কোনো ইমামও না থাকে (জনগণ সকলেই ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থাহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে), তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তুমি সে সকল দল (ফিরকা) সবগুলিকেই পরিত্যাগ করবে। যদি তোমাকে কোনো গাছের মূল কামড়ে ধরে পড়ে থাকতে হয় তাও থাকবে। এভাবে থাকা অবস্থাতেই যেন তোমার মৃত্যু এসে যায়।’’[6]

এসকল হাদীসে সুস্পষ্ট যে, জামা‘আত বলতে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঐক্য বা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণকে বুঝানো হয়েছে। এ সকল নির্দেশের অর্থ হলো, মুসলিম যে সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে বসবাস করবেন, সেই সমাজের মানুষদের রাজনৈতিক, সামাজিক সিদ্ধান্তাদির সাথে একমত থাকতে হবে, যদিও সেই সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত, তার দল বা গোষ্ঠীর মতামত বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।[7]

৬. ৫. ৩. ৩. সাহাবীগণই মূল জামা‘আত

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ ইফতিরাক বা বিভক্তি ছিল না। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক কিছু মতভেদ ছিল, তবে কখনোই ইফতিরাক-এর পর্যায়ে যায় নি। তাঁদের ইখতিলাফ বা মতভেদ ছিল মূলত ব্যবহারিক ও ইজতিহাদী বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতি বিষয়ে, যেখানে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ নিষ্পত্তি হয়েছে। আলী (রাঃ)-এর সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু মতভেদ যুদ্ধের পর্যায়ে গেলেও তা ‘ইফতিরাক’ পর্যায়ে যায় নি। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত: অধিকাংশ সাহাবী আলী (রাঃ) ও তাঁর বিরোধিতায় আয়েশা (রাঃ), মু‘আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর রাজনৈতিক মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। তাঁরা আলী (রাঃ)-এর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন এবং বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতেন। তবে মতবিরোধ ও যুদ্ধে অংশ নেন নি।

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শাবী (১০৪ হি) বলেন, জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধে সাহাবীগণের মধ্য থেকে ৪ জন ছাড়া কেউ অংশগ্রহণ করেননি: আলী, আম্মার, তালহা এবং যুবাইর (রাঃ)।’’[8]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন, ‘‘যখন ফিতনা শুরু হলো, তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে ১০০ জন সাহাবীও এতে অংশ গ্রহণ করেননি। বরং এতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ৩০ জনেরও কম ছিল।’’[9]

দ্বিতীয়ত: রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যার এরূপ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তারা সর্বদা একে রাষ্ট্রীয় ও ইজাতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে পৃথক ‘দল’ বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেননি। এ বিষয়ে আলী (রাঃ), আম্মার (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর সুস্পষ্ট মতামত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রাঃ)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়বাড়িমূলক কথা বললে আলী (রাঃ) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্মার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।’’[10]

এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আলী (রাঃ) ও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেননি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রাঃ) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[11]

এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তা কখনোই বিভক্তি বা ইফতিরাকের পর্যায়ে যায় নি। মহান আল্লাহ কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীসে সাহাবীগণকে আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাবিয়ীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল প্রজন্মের সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছেন। আর ‘জামা‘আত’ বলতে সাহাবীগণের পথ ও তৎপরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের পথ বুঝানো হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’ অর্থ ‘সুন্নাত ও জামা‘আতের অনুসারীগণ’। সুন্নাত বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর সুন্নাত বুঝানো হয় এবং সুন্নাতু খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতু সাহাবাহ এর অন্তর্ভুক্ত। আর ‘আল-জামাত‘আত’ বলতে মূলত সাহাবীগণের মত ও পথ বুঝানো হয় এবং পরবর্তী মূলধারার তাবিয়ী-তাবিয়গণের মতামত বুঝানো হয়, যারা সাহাবীগণের মত ও পথের উপর দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ফুটনোট

[1] শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা, আল-ই’তিসাম ২/২৫৮-২৬৫।

[2] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৬-১৪৭৭ নং ১৮৪৮।
[3] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৮, নং ১৮৫১।
[4] আবু দাউদ তায়ালিসী, আল-মুসনাদ ১/২৫৯, নং ১৯১৩, আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৩/২২৪। আবু নু'আইম বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ।
[5] আহমদ, আল-মুসনাদ, ৪/৯৬, আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আল-মুসনাদ ১৩/৩৬৬, ইবনু হিববান, আস-সহীহ ১০/৪৩৪, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১৯/৩৮৮, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৮, ২২৫। হাদীসটির সনদ যয়ীফ।
[6] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩১৯, ৬/২৫৯৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭৫।
[7] দেখুন: ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৭, শাওকানী, নাইলুল আউতার ৭/৩৫৬-৩৫৭।
[8] আল-খাল্লাল, আস-সুন্নাত ২/৪৬৬।
[9] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ৫/৩৫১।
[10] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস সালাত ২/৫৪৪-৫৪৬।
[11] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিববান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13785

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন